

ফেলে আসা সময়ের আশ্চর্য দলিল : পুণ্যলতা চক্রবর্তীর ‘ছেলেবেলায় দিনগুলি’

বিজয় দাস

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/17_Bijay-Das.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর ‘ছেলেবেলায় দিনগুলি’ একটি উল্লেখযোগ্য আত্মকথামূলক রচনা। গ্রন্থটির কুড়িটি পরিচ্ছেদে তিনি গল্পছলে কলকাতায় যে বাড়িতে তাঁরা ভাড়া থাকতেন সেই বাড়ির বর্ণনা, বাড়ির ভিতরের স্কুলের বর্ণনা, স্কুল জীবনের কথা, দাদা-দিদি-ভাই-বোনেদের পরিচয়, সম্বন্ধা হলে বিশাল বাড়িতে একসঙ্গে সবাই মিলে পড়তে বসা, নিত্যনতুন খেলাধুলা, ফেলে আসা দেশের কথা, পারিবারিক বংশ পরিচয় এবং পুরনো কলকাতার ছবি বিশ্বাসযোগ্যতায় তুলে ধরেছেন। আসলে পুণ্যলতার শৈশবের ফেলা আসা স্মৃতিমধুর দিনগুলির একটি আশ্চর্য দলিল ‘ছেলেবেলায় দিনগুলি’।

সূচক শব্দ: স্মৃতিকথা, রায়বাড়ি, পুরাতন, কলকাতা, পুতুলখেলা, কাঁকড়া, গোসাপ

পৃথিবীর নানা দেশে যে বিচিত্র সাহিত্যের শাখাগুলি বর্তমান রয়েছে তার মধ্যে সর্বদেশ সর্বকালের গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রিয় শাখা হলো ‘শিশু-কিশোর সাহিত্য’। আজকে যারা ছোটো একদিন তারাই হয়ে উঠবে দেশ-কাল-সমাজের ধারক ও বাহক। এইসব প্রদীপের মতো উন্মুখ ছোটোদের জন্যই সাহিত্য রচনায় নিজেদের যাঁরা উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁরা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শৈশব ও কৈশোরেই লুকিয়ে থাকা মহীরুহের সম্ভাবনাকে ভবিষ্যতে এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন হয় অনুশীলন ও চর্চা। এই চর্চা শুরু হয়েছিল রায়চৌধুরী পরিবারে। এই পরিবারেই একদিন বাংলা শিশুসাহিত্য বৃক্ষ অঙ্কুরোদগম থেকে ধীরে ধীরে ডাল পালা প্রসারিত করে ফুলে ফলে সুসজ্জিত হয়ে বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে। আর এই বৃক্ষের বীজ বপন করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। বাংলা শিশুসাহিত্য তিনিই আদি পুরুষ বা ভগীরথ।

উনিশ শতকের বাংলা সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্য জগতে দুটি পরিবারের নাম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করেছে। একটি ঠাকুর পরিবার আর একটি রায় পরিবার, এটি সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে। বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে রায়-পরিবার এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। কয়েক প্রজন্ম ধরে এই পরিবারের সদস্যরা শিশু কিশোর সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত আছেন। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তা। উপেন্দ্রকিশোর নিজে শুধু বই লিখেছিলেন তাই নয়, সেই বইগুলি ছেপে যাতে ছোটোদের হাতে পৌঁছায় তার জন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজস্ব উদ্যোগে প্রকাশ করেন ‘সন্দেশ’ নামক পত্রিকা। শুধু তাই নয় সমসাময়িক মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নিজেই মুদ্রণ সংস্থা স্থাপন করেন। তিনি শুধু এক নন সমস্ত পরিবারকে উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর ‘সন্দেশ’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক দল তৈরি করেছিলেন, সেখানে পরিবারের বাইরেই অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক বিনা পারিশ্রমিকে লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মূলত তাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে একটি উত্তরাধিকার গড়ে উঠেছে। তিনি যে বীজ রোপন করেছিলেন তা পরবর্তী সময়ে বিশাল মহীরুহতে পরিণত হয়েছিল। তাঁরই দ্বিতীয় কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী পরবর্তী কালের শিশু-কিশোর সাহিত্যের যোগ্য উত্তরসূরী।

প্রতিভা বিকাশের আবশ্যিক উপাদানগুলি রায় বাড়ির অন্দরমহলে যথেষ্টই ছিল। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা। ছোটোবেলা থেকে রায়বাড়ির ছেলেমেয়েরা সেই

পরিবেশের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল। এই পরিবারের সুযোগ্য কন্যা ছিলেন শিশুসাহিত্যিক পুণ্যলতা চক্রবর্তী।

১৮৮৯ সালে (২ভাদ্র, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ) খুশি ওরফে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর জন্ম। পিতা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর এবং মাতা বিধুমুখী গঙ্গোপাধ্যায়। পুণ্যলতার শৈশব কেটেছিল গান, গল্প, কবিতা, ছড়া, নাট্যকার আবহাওয়ায়। এ সব জিনিস আগেও কিছু লেখা হয়েছিল, তখন তার প্রধান উপজীব্য ছিল শিক্ষা। উপেন্দ্রকিশোরের মতো শিল্পীর হাত পড়ে, ছোটদের লেখা হয়ে যায় রসাত্মক। অতি অল্প সময়ে এই অসম্ভব সাধন হয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আরো কয়েকজনের সহযোগিতায়। সাহিত্যিক লীলা মজুমদার লিখেছেন, “তখনকার যত শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীত রসিক, সবাই এসে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে জড়ো হতেন। দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আলোচনা শুনে শুনে বাড়ির খুদে খুদে জাত লেখকরা মানুষ হয়েছিল।”^১

পুণ্যলতা চক্রবর্তীর ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ। লেখিকার জীবনকালে এই একটি মাত্র গ্রন্থ নিউস্ক্রিপ্ট সংস্থা থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে (আশ্বিন ১৩৬৫) প্রকাশিত হয়েছিল। পুণ্যলতার ‘ছেলেবেলায় দিনগুলি’ সেই অর্থে শিশুসাহিত্য না হলেও, লেখিকার গল্প বলার মেজাজটা এখানে ধরা পড়েছে। তবে লেখিকার ভাষায় বইটি ‘শুধু ছোটদের জন্য নয়। ছোটো বড় সবার জন্য।’^২ শিশু মনোরঞ্জনের অনেক উপাদান বইটিতে যেমন বর্তমান রয়েছে পাশাপাশি রায়-পরিবারের বহু অজানা তথ্য জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। পুণ্যলতা চক্রবর্তী নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কোনো ইতিহাস বওয়ার ভূমিকায় তিনি অবতরণ করেননি। এই স্মৃতিকথা তিনি একেবারেই গাঙ্কিক ঢঙে তাঁর ফেলে আসা ছোটবেলার কথা লিখেছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে নানা প্রসঙ্গ যেগুলি তিনি মনের আনন্দে সাজিয়ে ছিলেন নিজের খাতায়। এই গ্রন্থে একদিক যেমন আছে নিজের কথা, পাশাপাশি পিতা উপেন্দ্রকিশোর, দিদি সুখলতা, দাদা সুকুমার, ভাই সুবিনয়, সুবিনয়, বোন শান্তিলতা সহ কাকা কুলদারজুন, প্রমদারজুন এবং সর্বোপরি মা বিধুমুখীর কথাও স্বল্প পরিসরে পুণ্যলতা ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ তুলে ধরেছেন। কোনোদিন ভাবেননি এগুলো একদিন ছেপে বেরোবে। আদরের নাতিদের জন্য তিনি ছোটবেলার গল্প বলতেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন —

‘গল্প বল, দিদা’। বলে কাছে যখন আস,

শুধাই যদি ‘কোন গল্প শুনতে ভালবাস?’

‘তোমার ছেলেবেলার গল্প শুনতে মোরা চাই’^৩

‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ এখান থেকেই স্পষ্ট মধুর স্মৃতি জড়ানো সোনালি দিনগুলির মালা গাঁথে তিনি বঙ্গদেশের সকল ছেলেদের জন্য তুলে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির নিবেদন অংশে তিনি বলেছিলেন, “স্মৃতির পটে ছবির মত যা ফুটে উঠেছিল গল্পচ্ছলে তাই বলেছি। আমার আদরের নাতিরা এইসব গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে তাদের জন্য এগুলো খাতায় লিখে রেখেছিলাম বই করবার উদ্দেশ্যে ছিল না।”^৪

গ্রন্থটির কিছু কিছু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ছোটদের ভালোলাগার উপাদানগুলি আমরা অন্বেষণ করব — প্রথম পরিচ্ছেদে লেখিকা জানাচ্ছেন, ‘রোজ সন্ধ্যায় ছিল এখানে বসে গল্প শোনার পালা কত দেশ-বিদেশের কথা, রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প বাবা-মায়ের ছেলেবেলার গল্প’।^৫ গল্পগুলি শুনতে শুনতে রায়বাড়ির ছোটরা যেন কোনো স্বপ্ন রাজ্যে চলে যেতেন। বইটির আশ্চর্য গুণ ভাষার সরলতা। বড়োদিদিমার যখন ভারী রোজ গঙ্গার জল তুলে আনত। তখন সেই জলের সঙ্গে আসত ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁকড়ার ছানা, সেগুলোকে গামলার জলে রেখে পোষা হতো, এই গল্প বলার ঢঙ শিশুদের মুগ্ধ করে। কাঁকড়ার ছানা, বড়ো হলো সেগুলো গামলার কানা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া — শিশু মনোরঞ্জনের অসাধারণ উপদান। বইটিতে খেলাধুলার প্রসঙ্গ এসেছে — লুকোচুরি, চোর চোর, কুমির-কুমির কানামাছি — এখনকার কালে এই খেলাধুলা আমাদের কাছে অজানা। স্মৃতিপটে উঠে এসেছে একটা আনন্দের দিনের কথা। প্রসঙ্গটি ছোটদের কাছে বেশ মজার। পুণ্যলতা লিখেছেন, “সেদিন আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায়, শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন এ কিংবা অন্য কোথাও

বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত।” আবার চিড়িয়াখানার একটা বাঁদর একটি মেয়ের লালশাড়ির আঁচলটা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে নিজের গায়ে জড়িয়ে বসল এবং উপস্থিত সবাই তাকে ঠাণ্ডা করে বলতে লাগল, ‘এত লোক থাকতে তোমাই কেন পছন্দ করল বলতো? নিজের জাতের লোক বলে চিনতে পারল বুঝি?’^৬ এখানে বর্ণনার জটিলতা নেই, সহজসরল প্রকাশভঙ্গি ছোটোদের নির্মল হাসির উদ্রেক করে।

‘পঞ্চম পরিচ্ছেদে’ গোসাপ দেখে কুমির কুমির চিৎকার করে ওঠা বিষয়টিও বেশ মজার। সুন্দর কাকা যখন লেখিকাকে বলেছে, আরে, ওটা কুমির নয়, গোসাপ, এই যে কুমির, গোসাপ এগুলি সম্পর্কে ছোটোদের কল্পনার জগৎ তৈরি হয় এবং প্রকৃতি ও প্রাণীপাঠে এগুলি ছোটোদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটি তৈরি করে দেয়। ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ গ্রন্থটি ছোটোদের না হয়েও গল্পবলার ঢঙ ও কাহিনি নির্মাণে ছোটোদের উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তার ভাষার নমুনা দিই, ‘খাকো নদীতে, শ্লেট নদীতে, তিলোড়ি পাহাড়ে পিকনিক হত। গরুর গাড়িতে কিস্বা মানুষ টানা পুশপুশ গাড়িতে চড়ে যেতাম। খিচুড়ি রান্না হত, পায়ের, গাছতলায় বসে খেতাম। এ যেন ছবির ভাষা আবার চকমকি পাথর ঘষলে আগুনের ফুলকি’ — গল্পপাঠের কৌতুহলকে জাগিয়ে তোলে।

লেখিকা এই বইয়ে পুরনো কলকাতার অনেক চালচিত্র তুলে ধরেছেন। কলকাতার ঘোড়ায় টানা ট্রামের কথা যেমন বলেছেন পাশাপাশি খিদিরপুর ও আলিপুরের দিকে ইঞ্জিনে টানা ট্রামের কোথাও উল্লেখ করেছেন। এই ট্রামগুলো যতটা ধোঁয়া ছাড়ত আর যতটা শব্দ করত ততটা গতি ছিল না। সেই সময় কলকাতার মানুষ কাজকর্মে এবং অফিস যাওয়ার জন্য পালকি গাড়ি ব্যবহার করত। এছাড়া সেইসময় বাড়ির মহিলারা এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়ার জন্যে পালকি ছিল তাদের একমাত্র বাহন।

‘দশম পরিচ্ছেদে’ পুতুল খেলার প্রসঙ্গটিও বেশ চমৎকার। শিশুর উপর পরিবার বা সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তার মনোভাবে নানা পরিবর্তন আসে। একসময় ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, সে পরিবারের সীমা ছেড়ে বাইরের জীবনের স্বাদ পায়। লেখাপড়া ও নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতে পারে। প্রথম দিকে তারা সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু পরে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। বঙ্গদেশের শিশুদের খেলাধুলায় জায়গা করে নেয় পুতুল খেলা। পুতুলের সঙ্গে একান্তে কথা বলা, মান অভিমান প্রকাশ করা সবই চলে পুতুলগুলোকে ঘিরে। লেখিকা জানাচ্ছেন, দিদিদের সঙ্গে পুতুল খেলাও চমৎকার লাগত। মা সুন্দর করে দোতলা পুতুল ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন,... কত ডলি পুতুল, কাচের পুতুল, মাটির পুতুল খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, টি-সেট, ডিনার-সেট, পিতল ও মাটির কত হাড়িকুড়ি হাতাবেড়ি কত ঘরকন্না, রান্নাবান্না, শিশুরা যা শুনতে চায় তাদেরই মতন করে তিনি বলতে চেয়েছেন।

‘দ্বাদশ পরিচ্ছেদে’ খরগোশ প্রসঙ্গটিও শিশুর জগৎ কেন্দ্রিক। ধবধবে সাদা রঙের দু’জোড়া খরগোশ, লাল কাচের মতো চোখ, ঠোঁট নাক আর লম্বা কানের ভিতর দিকটি গোলাপি ভারি সুন্দর। শুধু তাই নয় খরগোশ কী খায়? কীভাবে খায় তার কৌতুহলও শিশুদের মনে জেগে ওঠে। লেখিকা জানিয়েছেন, “প্রথমে আমাদের দেখে ভয় পেত, পরে হাত থেকে ঘাস, ছোলা ইত্যাদি খেত”^৭ লেখিকার গল্প বলার ভঙ্গিমাটি অত্যন্ত চমৎকার।

‘অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে’ লেখিকা তাঁদের বংশতালিকার একটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পরিচ্ছেদে প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন, “বাবারা সাত ভাই বোন আর তাদের ছেলেমেয়েরা মিলে আমরা বেশ বৃহৎ পরিবার ছিলাম। তার মধ্যে অনেকেই কলকাতায় থাকতেন। কেউ কেউ দেশে থাকতেন কেউবা দূর দেশে চাকরি করতেন। কোন কিছু উপলক্ষে যখন সবাই একসঙ্গে মিলতাম তখন যেন এক সমান ব্যাপার হতো।”^৮ এই অধ্যায়ে পুণ্যলতা তাঁদের আদি পুরুষ রামসুন্দর দেও যিনি পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রাম ছেড়ে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে ছিলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন পূর্ব বাংলায় শেরপুর এলেন শেরপুরে জমিদার বাড়িতে যশোদলের রাজা গুণী চন্দ্র যুবকের সুন্দর চেহারা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে যশোদলে নিয়ে

এসেছিলেন। সেখানে ঘরবাড়ি ও জমি জমা করে দিয়েছিলেন। এমনকি তার সঙ্গে নিজের বিয়ে দিলেন। সেই থেকে রামসুন্দর যশোদলবাসী হলেন। তাঁর বংশধররাও অনেকদিন যশোদলে ছিলেন, পরে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে মসুরা গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই পরিচ্ছেদের বংশ পরিচয়টি একটি ঐতিহাসিক দলীয় বিশেষ। এই পরিচ্ছেদে পুণ্যলতা জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, ছটোকাকা প্রমদারঞ্জনের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে শেষ পরিচ্ছেদে এসেছে বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রাণপুরুষ সুকুমার রায়ের প্রসঙ্গ। সুকুমার রায়ের শৈশবের এমন প্রামাণিক তথ্য অন্যত্র সত্যিই বিরল। ছোটোবেলায় দাদাকে লেখিকা যেমন ভাবে দেখেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। লেখিকা এই পর্বে সুকুমার রায়ের সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি তিনি অসাধারণ অভিনয় দক্ষতায় এবং হাসির গানে সবার মন জয় করেছিলেন সেই দিকটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন।

পুণ্যলতা চক্রবর্তীর এই গ্রন্থখানিতেও শিশু-কিশোরদের মনের খোরাক যথেষ্ট রয়েছে। একথা বলতেই হয় রায়বাড়ির সাংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে ওঠা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর লেখনীতেও শিশুদের মনোপোযোগী ও মনোরঞ্জনের জোগান রয়েছে। রায়বাড়ির অপ্রধান শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এদিক থেকে তিনি রায়বাড়ির যোগ্য উত্তরসূরী। যে গাছে সুকুমার ফুটে ছিলেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী ছিলেন সেই গাছেরই ফুল।

সকলেরই একটা প্রত্যাশা থাকে যে, আজকের শিশুরাই আগামী দিনে আদর্শ নাগরিক হিসাবে বিকশিত হবে সমাজে। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে যাদের ভূমিকা থাকবে। দেশগঠন, মানবসেবা, দেশ প্রেমে এক একজন হয়ে উঠবে আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ। এদেরই জ্ঞান, গড়িমা চরিত্রবিকাশে যাঁরা কলম ধরে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রায়বাড়ির পুণ্যলতা চক্রবর্তী। পরিবারকেন্দ্রিক পরিচিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বকীয়তায়, স্বমহিমায় ও স্বপ্রতিভায় ভাস্বর শিশুসাহিত্যিক পুণ্যলতা চক্রবর্তী। বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর নাম স্বর্ণাঙ্করে লেখা থাকবে। সাহিত্যিক লীলা মজুমদার পুণ্যলতা চক্রবর্তীর রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, “একটিও মন-গড়া নয়, ঘটনা যাই হোক-না কেন, গল্পের শিকড় হল মনের সেই গহন গভীর যেখানে কৃত্রিম কিছু পৌঁছায় না।”^১ এখানেই পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কৃতিত্ব, আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদটি পাঠ্য হিসাবে নির্বাচন করে তার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছে। শিশুসাহিত্যিক পুণ্যলতা চক্রবর্তীর বইগুলো সব বাঙালি ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার।

তথ্যসূত্র:

১. ‘লীলা মজুমদারের রচনাবলী’, লীলা মজুমদার, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৫৪, প্রথম প্রকাশ ১৩৬১, কলকাতা ৭, পৃ. ৩৪০
২. ওই, পৃ. ৩৪২
৩. ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬, উৎসর্গ পত্র
৪. ওই, নিবেদন অংশ
৫. ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬, পৃ. ১০
৬. ওই, পৃ. ৭৬
৭. ওই, পৃ. ১১৩
৮. ‘লীলা মজুমদারের রচনাবলী’, লীলা মজুমদার, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৫৪, প্রথম প্রকাশ ১৩৬১, কলকাতা ৭, পৃ. ৩৪১

লেখক পরিচিতি: বিজয় দাস, গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।